তনয়ার অসুখ

ধরিত্রী গোস্বামী

জ্বরের ঘোরে চাদর মুড়ি দিয়ে আধো অন্ধকার ঘরটার মধ্যে পড়েছিল তনয়া। কলিং বেলটা বোধহয় বেশ কয়েকবার বেজে ওঠার পর তবে সে খেয়াল করতে পারলো কেউ তাকে ডাকছে। টলোমলো পায়ে উঠে গিয়ে আইহোলে চোখ লাগালো সে। একমুখ কাঁচাপাকা দাড়িওলা মুখটা খুব চেনা চেনা লাগলেও সে ঠিক খেয়াল করতে পারছিলো না। অচেনা কাউকে দরজা খুলবে কি খুলবে না ইতস্তত করতে করতে মোবাইলটা বেজে উঠলো। তনয়ার মা ফোন করেছেন,

'হ্যালো মা'

'শোন তনয়া, তোমার আজই ডাক্তার দেখানো উচিত। কোলকাতায় খুব ডেঙ্গু হচ্ছে। যিনি তোমাকে ডাকতে গেছেন তার সঙ্গে নিশ্চিন্তে যাও, উনি তোমাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবেন বলেই এসেছেন।'

'কিন্তু মা'

'শোন তনয়া, এটা তর্ক করার সময় নয়। আজ তিনদিন হলো তোমার জ্বর। খবর দাওনি। এখন রাত ন'টা। আমি তো কাল বিকেলের আগে পৌঁছতেই পারবো না। যদি কিছু বিপদ হয় তখন কি করব বলতো?'

এক মন বিরক্তি নিয়ে দরজা খুললো তনয়া। এবারে মানুষটাকে সে চিনতে পারলো। ছবিতে দেখেছে। বিবেকবাবু, মায়ের বন্ধু। মায়ের যে এই বয়সেও কত পুরুষবন্ধু। সারা বাংলা জুড়ে। নানা বয়সের, নানা পেশার! বিবেক ভট্টাচার্য কবিতাটবিতা লেখেন। লিটিল ম্যাগাজিনের একজন প্রখ্যাত কবি। কোথাও একটা চাকরিটাকরিও করেন নিশ্চয়। কবিতা লিখে তো আর ওনার পেট ভরে না নিশ্চয়ই। মায়ের সঙ্গে এই লেখালেখির সূত্রেই আলাপ। তনয়ার মা-ও একজন লেখিকা। উত্তরবঙ্গের।

'চলো তনয়া, তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। আজ তিন দিন ধরে জ্বরে পড়ে আছ, তোমার মা দারুণ চিন্তা করছেন।'

'কিসে করে যাব?' তনয়া নিশ্চিত এ লোকটার গাড়ি নেই।

'রিক্সায়, দাঁড় করিয়ে রেখেছি।।'

এই লোকটার পাশে বসে রিক্সায় যেতে হবে? এই কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঝোলানো দাড়িমুখো আঁতেলগুলোকে দেখলেই গা জ্বলে ওঠে তনয়ার। কিন্তু কিছু করার নেই। মা বলছেন। তা ছাড়া সত্যি খুব অসুস্থ আর দুর্বল লাগছে তার। তিনদিন ধরে জ্বর হয়েছে।

একলা ফ্ল্যাটে কাঁথামুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। খাওয়া-দাওয়াও জোটেনি সেরকম। তবু সে একবার প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা করে,

'হাসপাতাল কেন? কাছে কোন ডাক্তারখানা নেই? আমি হেঁটেই যেতে পারবো।'

'হাসপাতালটাও কাছেই। মিনিট দশেক। আমার বন্ধু ওখানের ডাক্তার। তোমার জন্য তাকেও আটকে রেখেছি বহুক্ষণ। চল, চল। আর দেরি কোর না।'

লিফটে করে নিচে নেমে রিক্সায় ওঠে তনয়া। বিবেকবাবু অবশ্য রিক্সায় ওঠেন না। সাইকেল নিয়ে চললেন পিছন পিছন।

নতুন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। ঝাঁ চকচকে নতুন। বিবেকবাবুর ডাক্তার বন্ধুর সৌজন্যে খুব তাড়াতাড়ি করে রক্ত পরীক্ষা হয়ে গেল তনয়ার। রিপোর্টও পাওয়া গেল তাড়াতাড়ি। ডেঙ্গুই। ভর্তি হতে হল। রক্তে নাকি প্লেটলেট কম। আরো কমল রক্ত দিতে হতে পারে। তনয়া আড়চোখে দেখলো বিবেকবাবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে একতাড়া নোট জমা দিলেন কাউন্টারে। কিছু পরেই ওকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে ওয়ার্ডে নিয়ে চলে গেল আয়া। বিবেকবাবু বললেন, 'ভয় নেই, আমি রাতে এখানেই থাকছি। তোমার মা কাল এসে পড়বেন।'

এইচ ডি ইউ ওয়ার্ড। অনেক রকমের খারাপ খারাপ রুগি ভর্তি। জ্বরের রুগিই বেশি। তনয়ার এ সব ভালো লাগে না। ছেলেবেলা থেকে তো কত জ্বর হয়েছে। কখনো তো হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি তাকে! বাবা ডিসপেনসারি থেকে ওষুধ এনে দিতেন; তাতেই জ্বর ভালো হয়ে যেত। এসব এই বিবেকবাবুর পাকামি। মাকে দেখাচ্ছেন উনি কত কি করতে পারেন। কিংবা ওঁর কত চেনাশুনা। হয়ত এভাবে মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বটাকে আরো গভীরে টেনে নিয়ে যেতে চান। মা যে কেন এত বোকা, ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে যায় তনয়ার চোখে।

এরপর তনয়ার যখন ঘুমের ভাব কাটে তখন কোথা দিয়ে ক্যালেণ্ডারের পাতায় আট আটটা দিন পেরিয়ে গেছে। তনয়া কিছু জানতে বুঝতে পারে নি। কেননা ওর তো কোন হুঁশই ছিল না। এর মধ্যে ওকে হাসপাতালের আই সি ইউতে শিফট করা হয়েছে। দিন দুয়েক ভেনটিলেটরেও রাখতে হয়েছে। সিঙ্গল ডোনার প্লেটলেট দিতে হয়েছে ছয়বার। তার মধ্যে বিবেকবাবুর সঙ্গে ওর গ্রুপ মিলে যাওয়াতে উনি দিয়েছেন রক্ত, মা দিয়েছেন। বাকিটা ব্লাড ব্যাঙ্ক। বাবাও এসেছেন মায়ের সঙ্গে কিন্তু রক্তের গ্রুপ মেলেনি। সাধে কি আর মা বাবাকে বলেন 'এক্কেবারে অপদার্থ'। কোন কাজেই লাগে না মানুষটা। নিজের তালে থাকেন। অপিস করেন, বাগান করেন আর বই পড়েন। তাই তো মা বলতেন 'এত পড়েও কিছুই শিখতে পারলে না তুমি! আসলে পড়া তো নয়, দায় দায়িত্ব এড়াবার ছল এসব।' শুনেও বাবা চুপ করে থাকতেন, কোন উত্তর দিতেন না। মা তাতে আরো ক্ষেপে যেতেন। দুমদাম করে যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তেন। বেশ রাত করে ফিরতেন। তনয়া অস্থির হলে বাবা মুচকি হেসে ভোলাতেন, 'দাঁড়া না, মা একটু মনটা ভাল করতে গেছে। চলে আসবে।'

এই সব দেখে দেখেই তনয়ার বড় হয়ে ওঠা। সংসারে শান্তি ছিল না কোনদিন। ছোটবেলায় যতদিন ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন তবু আনন্দে কেটেছে। মাও ঠাকুমাকে খুব ভালবাসতেন। বউ আর শাশুড়ি মিলে কত কি রান্না চলত দিন রাত। ওরা ভাই বোনে শুধুই খেত। বাবা চিরকালই সরে সরে থাকতেন সংসার থেকে। ছেলের উদাসীনতা ঠাকুমা পুষিয়ে দিতেন। বাজার করা, ওদের সঙ্গ দেওয়া, খেলতে নিয়ে যাওয়া, সব সামলাতেন তিনি। কিন্তু ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর থেকেই বাবার সঙ্গে মায়ের খিটিমিটি বাড়তে লাগলো। বাবা সংসারের কিছু করতেন না। মা কিছু আনতে বললে ভুলে যাবেন। কিংবা অন্য কিছু একটা নিয়ে হাজির করবেন। ওদের লেখাপড়ার ব্যাপারটাতেও গা করতেন না তেমন। স্কুলে ভর্তি করা, মাস্টার জোগাড় করা, স্কুলে প্রয়োজন পড়লে গিয়ে দেখা করা, সব মা। বাধ্য হয়ে মাকে মোপেড চালানো শিখতে হলো। তাতে অবশ্য উপকার হলো অনেক, মায়ের চলাফেরার স্বাধীনতা বেড়ে গেল বহুগুণ। আর বাবার পেছনে চেঁচাতে হত না মাকে। নিজেই যতটা পারতেন করে নিতেন। তাতে সংসারে ওপরে ওপরে একটা শান্তি ফিরে এলেও ভিতরের অগ্নুৎপাতটা টের পেত তনয়া। কেননা তনয়া ততদিনে একটু বড় হয়ে উঠেছে।

মা হঠাৎ দুম করে একটা চাকরি নিলেন যখন ওরা হাই স্কুলে। প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভুগোল টিচারের চাকরি। বাবার আপত্তি ছিলো খুব কিন্তু মা শুনলেন না। আসলে বাবার একার রোজগারে ওদের অসুবিধে হচ্ছিলো সেটা ঠিক। ওরা বড় হচ্ছিল'আর খরচও বাড়ছিল সমান তালে। সংসারে সব সময় একটা অভাবের নিঃশ্বাস শুনতে পাওয়া যেত। কিন্তু বাবার কোন মাথা ব্যথা ছিল না তার জন্য। মাসমাইনে হাতে পেলে মায়ের হাতে সেটা সমর্পণ করে পুরোপুরি দায়মুক্ত থাকতেন। না উপরি রোজগারের চেষ্টা, না হিসেবনিকেশ, না সঞ্চয়। ফলে চাকরিটা নিয়ে মা ভালই করেছিলেন। আর নিজের বাঁচার জন্য আলাদা একটা জগৎ খুঁজে পেয়ে মা স্বস্তিও পেয়েছিলেন খুব। তখন থেকেই মায়ের লেখালেখি শুরু।

এরপর ওরা দুই ভাইবোন একে একে ঘর ছাড়লো। এখন ভাই চলে গেছে কানাডায়। উদ্যোগটা ওর নিজের এবং উৎসাহটা মায়ের। বাবা একেবারেই চায়নি একমাত্র ছেলেকে কাছ-ছাড়া করতে। মাই একরকম জোর করে ওকে পাঠিয়েছেন। 'এই ভূতুড়ে সংসারে থাকলে তুমি আর একটি অকর্মণ্য তৈরি হবে।' ভাইকে বুঝিয়েছিলেন মা।

তনয়া প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে। ফিজিক্স অনার্স। থাকে মধ্য কলকাতার একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে। একাই থাকে, নিজেই রান্নাবান্না করে নেয়। বাবার এতেও ঘোর আপত্তি ছিলো কিন্তু মা পাত্তা দেননি। 'নিজে করে খাবে তাতে কি হয়েছে? তোমার মতো আজীবন মায়ের আঁচল-ধরা হয়ে রয়ে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎটার বারোটা বাজাবে নাকি?' আজকাল উঠতে বসতে মা ঠাকুরমার উদ্দেশ্যেও গালাগাল দিতেন। এমন একটা অপদার্থ সন্তানের জন্ম দেবার জন্য। তাকে সারা জীবন দুধে-ভাতে করে রেখে দেবার জন্য। আর শেষ অব্দি তাকে মায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে কেটে পড়ার জন্য।

আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছে তনয়া। আজ রাউণ্ডে এসে ডাক্তারবাবু বলে গেছেন আর দিন দুয়েকের মধ্যে ওকে ছুটি দেওয়া যাবে। আজই ওকে আবার এইচ ডি ইউ ওয়ার্ডে ফেরৎ পাঠাতে বলেছেন। হাঁফ ছেড়েছে তনয়া। আই সি ইউটা বড্ড দমবন্ধ-কর' পরিবেশ। চারপাশে মৃত্যুর গন্ধ। তাছাড়া তনয়া জানে এই ওয়ার্ড থাকার খরচও প্রচুর। কিভাবে মা সামলাবেন সব জানে না তনয়া। বিবেকবাবু ভর্তির সময় যে টাকা জমা দিলেন সেই ধারটাও তো মেটাতে হবে!

এইচ ডি ইউ ওয়ার্ডে সকাল এগারোটায় ভিজিটিং আওয়ার্স। মা আসেন, সঙ্গে বিবেকবাবু। দুজনেই পালা করে তনয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। মায়ের দুই চোখের তলায় কালো কালির দাগ দেখতে পায় তনয়া। ভাই নাকি ফোন করে খোঁজখবর নিয়েছে দিদির। হঠাৎ মনে পড়ে যায় তনয়ার, 'মা হাসপাতালে ভর্তির সময় কিন্তু উনি টাকা দিয়েছিলেন, তুমি ফেরৎ দিয়ে দিও।' বিবেকবাবুকে দেখিয়ে বলে তনয়া। হেসে ফেলেন বিবেকবাবু আর মা দুজনেই। 'ওসব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।' হাল্কা ধমকের সুরে বলেন বিবেকবাবু। গলার স্বরে তনয়া বুঝে যায় টাকাটা ফেরতের কথা মা বা বিবেকবাবু কেউই ভাবছেন না। কিন্তু অতগুলো টাকা কি ভদ্রলোক এমনি এমনি দিয়ে দেবেন নাকি বিনিময়ে মায়ের কাছে অন্য কিছু দাবি রাখবেন? মনটা খারাপ হয়ে যায় তনয়ার। বাবার ওপর রাগও হয় খুব।

বিকেলবেলায় আবার ভিজিটিং আওয়ার্স। ঘুমিয়ে পড়েছিলো তনয়া। হঠাৎ চোখ মেলে দেখে মাথার কাছে একটা টুলে বাবা বসে আছেন। তনয়ার ঘুমন্ত মুখটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। দুই চোখ চিকচিক করছে মানুষটার। বাবাকে অমন অসহায়ের মতো চুপচাপ কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে যায় তনয়া।

উঠে বসে বলে, 'কি হল, কাঁদছ কেন?'

চোখ মুছতে মুছতে বাবা বললেন, 'তোর এত বড় অসুখে কিছুই তেমন করতে পারলাম না আমি।'

এর উত্তরে কি আর বলবে তনয়া, খারাপ তো তার নিজেরও লাগছিল।

তিনদিন বাদে মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলো তনয়া। বাবা নাকি আগেই ফিরে গেছেন অপিস করার জন্য। ডাক্তার দশদিনের ছুটি লিখে দিয়েছেন, বিশ্রাম নিতে বলেছেন। বিবেকবাবু ওদের ট্যাক্সিতে করে শিয়ালদায় ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন। ট্রেন ছাড়ার আগে পর্যন্ত মা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলে গেলেন। মাকে খুব নিশ্চিন্ত লাগছিলো। চোখের তলার কালিও কেটে এসেছে। হাসতে হাসতে দু-একবার চাপড় মারলেন বিবেকবাবুর গায়ে। বন্ধুত্বসুলভ চাপল্যে। মাকে এত ছেলেমানুষের মতো হাসতে কখনো দেখেনি তনয়া। ও বুঝতে পারছিলো না কি করবে। মায়ের এই খুশিতে কি ওরও খুশি হওয়া উচিত? কিন্তু ওর যে ভেতরে ভেতরে রাগ হচ্ছিলো খুব! গলার কাছটায় আটকে বসছিলো কি একটা কষ্ট!

ট্রেন ছাড়তে বিবেকবাবুকে টা-টা করে মা এসে তনয়ার পাশটাতে বসলেন। কিছুক্ষণের

মধ্যেই প্লাটফর্ম ছেড়ে শহরতলীর মধ্য দিয়ে ছুটে চলল ট্রেন। বাইরেটা সবুজ সবুজ হয়ে উঠলো। তনয়ার মনে পড়লো এটা আশ্বিন মাস। আর দিন দশেক পরেই পুজো। ও তাহলে পুজোর ছুটি কাটিয়েই ফিরবে একেবারে। অনেক দিন বাড়িতে গিয়ে টানা একসঙ্গে থাকা হয়নি।

বাড়ি ফিরে কিন্তু খুশি হতে পারলো না তনয়া। প্রায় পাঁচমাস বাদে এই বাড়ি এলো ও। গেট খুলে ঢুকতেই বুঝলো বাবার শখের বাগানটা আগাছায় ভরে গেছে। এতদিনে তো গোলাপ গাছের পরিচর্যা আরম্ভ হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। তা হয়নি। বেডগুলো কাঁটাগাছে ভর্তি হয়ে আছে।

'একি বাবা, বাগানটার এমন দশা করে রেখেছ কেন?' অনুযোগ জানায় তনয়া।

'এই ত তুই এসেছিস, এবারে লেগে পড়ব,' মৃদু হেসে বললেন বাবা।

সারাটা সংসারে কেমন যেন অযত্ন অগোছালো ছাপ। সোফার কভারটা দেখলেই মনে হচ্ছে অনেকদিনের ময়লা পড়া। বাথরুমের টাইলসগুলোয় শ্যাওলা ধরে গেছে। মা কি আর কিছুই দেখেন না? আর বাবা?

দিন দুই শুয়েই কাটালো তনয়া। তারপর কিছুটা ধাতস্থ লাগলো নিজেকে। আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগছিলো না। সে মনে মনে ঠিক করলো বাবা মা যেমন চলছেন চলুক, পুজো এসে পড়বার আগেই নিজে পুরো বাড়িটা গুছিয়ে ফেলবে। আর লোকেশকাকাকে খবর পাঠাতে হবে, এসে বাগানটা পরিষ্কার করতে শুরু করবে। ওর বউ ত এ বাড়িতেই ঠিকের কাজ করে।

সেদিন সক্কাল সক্কাল বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এলো তনয়া। সবে ভোর হচ্ছে, নানা রকম পাখি কিচিরমিচির করছে বাগানের ঝোপে। বাবার ঘর থেকে মায়ের গলার শব্দ পেলো তনয়া,

'আমাকে একবার পঞ্চমীর দিন কোলকাতা যেতে হবে। অন্য সময় হলে কথা ছিলো না কিন্তু এখন মেয়েটা শরীর খারাপ নিয়ে বাড়ি আছে! তুমি কি দয়া করে একটু দায়িত্ব নিতে পারবে?'

'এই ত কোলকাতায় এতদিন কাটিয়ে এলে। আবার কি?' বাবার চাপা স্বর শোনে তনয়া।

'জীবনানন্দ সভাঘরে বিবেকবাবুদের পত্রিকার উদ্বোধন। আমাকে ডেকেছেন। কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ।'

'না গেলেই কি নয়? এমন কত আমন্ত্রণ ত লেগেই রয়েছে বছরভর। এটা না হয় থাক।'

'তা হয় না। ভদ্রলোক কত করলেন তনুর অসুখে। আর এই অনুরোধটুকু রাখবো না।'

'তনুর অসুখে উনি না করলেও তুমি যেতে, তাই না?'

'অসভ্য, বেইমান,' ফোঁসফোঁস করে ওঠে মা।

'আমি না তুমি?'

এবারে ঠকাস্ করে চায়ের কাপ ছোঁড়ার শব্দ পায় তনয়া। তারপর দুম করে দরজা বন্ধ

হওয়ার আওয়াজ। তনয়া টের পায় তার পা-দুটো থরথর করে কাঁপছে। বাড়িঘর গুছোবার পরিকল্পনা ছেড়ে সে আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

পঞ্চমী নয় চতুর্থীর দিন দুপুরেই কোলকাতা রওনা হয়ে গেলেন মা। যাবার সময় তনয়ার ভাড়া ফ্ল্যাটের চাবি চেয়ে নিয়ে গেলেন, ওখানেই উঠবেন আর গোছগাছ করে দিয়ে আসবেন খানিকটা। তনয়াকে সাবধানে থাকতে বলে, আদরটাদর করে মা বেরিয়ে পড়লেন। বাবা খেয়েদেয়ে উঠে কাগজ ওলটাচ্ছিলেন, ফিরেও দেখলেন না। মাও কিছু না বলেই চটি ফটফটিয়ে গিয়ে রিক্সায় উঠলেন।

সেদিন বিকেলে ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে তনয়া দেখে বাবা ঝুঁকে পড়ে গোলাপ গাছের ডালপালা ছাঁটছে। আর লোকেশকাকু হাত কোদাল নিয়ে পরিষ্কার করছে গাছের গোড়াগুলো। অনেকক্ষণ ধরে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে কেন কে জানে চোখে জল চলে এলো তনয়ার। খেয়াল করে নি কখন সন্ধে নেমে গেছে।

অল্প অল্প ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। কোলকাতায় হয়ত তত নয় কিন্তু উত্তরবঙ্গের এই মফস্বলে বেশ শীত শীত আমেজ এসে গেছে। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বাবা বারান্দায় বেরুলেন সিগারেট খেতে। তনয়াও গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'ভাই অনেকদিন বাড়ি আসেনি, কবে আসবে কিছু বলে?'

'না, ওকে স্কলারশিপের টাকা থেকে কিছু কিছু জমিয়ে তবে ত আসতে হবে। অনেক টাকার ধাক্কা। মনে হয় এ বছর আসতে পারবে না। দেখি যদি আমি কিছু পাঠাতে পারি'

'আমার অসুখের সময় তোমার অনেক খরচা হয়ে গেল না বাবা?'

'না, না, আমি করার সুযোগ পেলাম কই? তোর মা-ই তো সব'

'না, মা সব দেয়নি। ওই বিবেকবাবু বলে লোকটা অনেক টাকা দিয়েছে ভর্তির সময়। আমার ভাল লাগে না বাবা। কি দরকার ছিলো আমার এভাবে বেঁচে ফেরার?'

বাবা অবাক হয়ে মেয়ের চোখের দিকে তাকান। সেই ছোট্ট মেয়েটা কবেই যেন বড় হয়ে গেছে। অনেককিছু বুঝতে শিখেছে।

'না মা, তোমাদের এক একটা জীবনের অনেক মূল্য। অত সেন্টিমেন্টাল হলে চলে না। তাছাড়া তোমার ওপরে তোমার মায়েরও অনেকখানি অধিকার। তিনি যেভাবে ভালো বুঝেছেন...' থেমে যান বাবা।

পায়ে পায়ে বাগানের ঘাসে নেমে আসে তনয়া। বাড়ির সামনে কাঠের গেটটার দিকে এগিয়ে যায়। গেটে পৌঁছে পেছন ফিরে বাড়ির দিকে তাকায় আবার। ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে। সেই আলোর উজ্জ্বল পটভূমিতে বাবার অন্ধকার সিলুয়েটে ভবিতব্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আলতো করে আঙুলের ডগা দিয়ে সামনের শিউলি গাছটার একটা ঝুঁকে পড়া ডাল ছুঁয়ে ফেলে তনয়া। টুপটাপ দু-একটা সাদা ফুল ঝরে পড়ে যায় মাটিতে। তনয়ার মনে হয় বাবার চোখের নিঃশব্দ জল ঝরে পড়লো বুঝি! তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে ঝরে পড়া ফুলগুলি নিজের হাতে তুলে নেয় তনয়া। ফিরে চলে ঘরের দিকে। বাবার কাছে।